শেষ দেখা

মিনহাজ আহমদ

(ক)

শিরোনাম দেখে পাঠকরা হয়তো হর্ষ-বিষাদে মাখানো আনন্দ-বেদনায় ভরপুর একটি গল্পের প্রত্যাশা করছেন। আমার এ লেখায় আসলে সেরকম কোন গল্প নেই। যে গল্প আছে, তা আমাদের জীবনের গল্প। আর মানুষের জীবন নিয়ে যে গল্প হয়, সে গল্প জীবনের মতোই চলমান। এর এক অধ্যায় শেষ হয়, তো শুরু হয় আরেক অধ্যায়। যতোদিন জীবন-গল্পের পাত্রপাত্রী কিংবা পাঠক-পাঠিকা বেঁচে থাকেন, ততোদিন গল্প এগোয়। অন্যভাবে বলা যায়, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন-গল্প পরিণতি লাভ করে।

এই গল্পটি আমি নিজের অগোচরে মনের অবচেতনে বিগত চল্লিশ বছর ধরে পুষে আসছিলাম। গল্পটির প্রসঙ্গ একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক জায়গায় উঠে আসলেও 'শেষ দেখা' প্রঙ্গটি কখনও সচেতনভাবে মাথায় আসেনি। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে পরিণতিহীন অবস্থানে ঝুলে থাকা জীবন-গল্পের হৃদয়স্পর্শী এই অধ্যায়ের মূল্যায়নই আজকের এই লেখাটির উপজীব্য।

(খ)

স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া এগারো/বারো বছরের বালক। মিছিল করেছি, লুকোচুরি খেলার মতো কারফিউতে মিলিটারির চোখ ফাঁকি দিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে বেড়িয়েছি। সুযোগ পেলেই জয় বাংলা শ্লোগান দিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছি। সে সময় দেশ স্বাধীন করতে হলে যুদ্ধ করতে হবে, এরকম একটা কথা বলছিলেন সবাই। কিন্তু স্বাধীনতা জিনিসটা প্রকৃতপক্ষে যে কী, সেটা বুঝার উপযুক্ত বয়স আমার ছিলোনা। তবে মনে আছে বিশাল ক্যানভাসে আঁকা একটি পোস্টারের কথা। পোস্টারটি সত্তরের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের এক জনসভায় প্রদর্শিত হয়েছিলো। একটি গাভী ঘাস খাচ্ছিলো আমাদের দেশে, আর দুধ দিচ্ছিলো পাকিস্তানে। ততকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্যের একটা পরিসংখ্যানও ছিল বিশাল সেই পোস্টারে। রাজনীতির জটিল পাঠ না বুঝলেও আমাদের দেশের মানুষদের প্রতি যে অন্যায় করা হচ্ছে, সে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আন্দোলন কিংবা প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে, সেটা আমার মতো এগারো/বারো বছরের বালকের কাছেও স্পষ্ট ছিলো। এসব সিরিয়াস চিন্তার সাথে জনজীবনে মিলিটারির উপস্থিতি, তাদের সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ইত্যাদি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ুয়া এগারো/বারো বছরের বালকটিকে একটি রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন করতেই পারে। কিন্তু সাতাশে মার্চ কারফিউ ভাঙতে আসা বিশাল মিছিল, গুলির শব্দ, নিরপরাধ মানুষকে গুলি করে হত্যা করে মনু নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া- ইত্যাদি ঘটনাগুলো চোখের সামনে ধারাবাহিকভাবে ঘটে যেতে দেখে বালক মনে জেগে উঠা সকল রোমান্টিকতা আচমকা দূর হয়ে যায়। আর তার অবচেতনে স্থায়ী হয়ে গেঁথে যায় অসংখ্য ঘটনা, দৃশ্য, এবং স্মৃতি। সেসব ঘটনা, দৃশ্য, এবং স্মৃতির একটি নিয়েই 'শেষ দেখা' নামের এই লেখা।

(গ)

কানুদা এবং তাদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বাসার ভাড়াটে। পুরনো ভাড়াটে হিসেবে পারিবারিকভাবে তারা আমাদের খুব ঘনিষ্ট ছিলেন, অনেকটা অত্মীয়ের মতো। শ্যামলদা, কানুদার ছোটভাই, ছিলেন আমার মেঝো ভাইয়ের সহপাঠী এবং আমার শৈশবের গল্পদাদু। তার কাছ থেকে রামায়ণ-মহাভারত এবং সিনেমার গল্প শুনতাম। যা বলতেন, তা-ই হা করে গিলতাম। তাই তাৎক্ষণিক বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেও আমাকে বোকা বানাতেন শ্যামলদা। কানুদার সাথে আমার মনে রাখার মতো উল্লেখযোগ্য স্মৃতি একটাই, সেটা হলো ঢাকা দর্শন। এছাড়াও মনে আছে, সত্তরেরর ঘুর্ণিঝড়ের সময় মৌলভীবাজার শহরে "ভিক্ষা দাও-গো নগরবাসী" ব্যানার নিয়ে মিছিল করে চাল-ডাল-কাপড়-নগদ অর্থ ইত্যাদি ত্রাণসমাগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন কানুদা। তারপর সে ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে কানুদা চলে গেলেন উপদ্রুত চট্টগ্রামের দূর্গত এলাকায়। একাত্তরের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও বসে থাকেননি তিনি। তাঁর রাজনৈতিক দল ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) পক্ষে তিনি জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বক্তৃতায় শ্লোগানে মুখরিত রাখেন সভা, মিছিলের পুরোভাগ। মার্চ মাসের সেই উত্তাল দিনগুলোর একটিতে মিছিল শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের পতাকা পুড়ানোর নেতৃত্ব দেন কানুদা।

স্বাধীনতা আন্দোলনকে সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সারাদেশব্যাপী এরকম হাজার হাজার ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতিবিদ-শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছিলেন। আমাদের কানুদা ছিলেন তেমন একজন সর্বস্বত্যাগী মানুষ। স্বাধীনতার জন্য শহীদ হওয়া আমার আমার ঘনিষ্টদের মধ্যে প্রথম।

(ঘ)

একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চের শীতের ভোরে আমাদের কাজের মেয়ে মুরগির খুপরি ঘরে গুটিশুটি মেরে লুকিয়ে বসে থাকা দুজন পুরুষমানুষ আবিষ্কার করলো। এদের একজন কাঠমিস্ত্রী অবনী সূত্রধর, অপরজন কানুদা। দুজনই আমাদের পড়শি। রাস্তায় আর্মির টহল দেখে এবং বিবিসির খবরে চলমান আক্রমণের খবর শুনে, এবং সম্ভাব্য হিংস্র আক্রমণের আশঙ্কায় সবাই তখন উদ্বিগ্ন। সিলেট থেকে আসার পথে মনিপুরি পড়শী নিতাই সিং স্বচক্ষে কতো কামান-বন্দুক-সৈন্য-সামন্ত দেখেছেন, টহলরত আর্মি দলের আসা এবং যাওয়ার অন্তর্বর্তী সময়ে বাসার সামনের সরকারি দিঘীর পাড়ে জমায়েত পড়শিদের কাছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে শহরে অবস্থান করা সমীচীন নয় বিবেচনা করে আমাদের রান্নাঘরে চা-নাস্তা খেতে খেতে স্থির হলো, কানুদা এবং অবনী সূত্রধর সৈয়ারপুরের মধ্য দিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাবেন। সেই অনুযায়ী তারা সকাল সাতটার দিকে আমাদের বাসা থেকে বের হন। কিন্তু বিপদ যেনো কানুদার জন্য ওত পেতে বসেছিলো। তাই সেদিন আমাদের বাসা থেকে বের হয়ে অবনী সূত্রধর গা-ঢাকা দিতে সফল হলেও কানুদা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে যান পাক-সেনাদের হাতে। তাৎক্ষণিকভাবে এই ধরা পরা যে কতোটা ভয়াবহ হতে পারে, সেটা আমার মতো অনেকেই তখন অনুমান করতে পারেনি। ঘটনাটির চূড়ান্ত পরিণতি অনুধাবন করতে অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও দুটি দিন। এই দুদিনে বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং আকাশবাণী শুনিয়েছে অসংখ্য উদ্বেগ-জাগানো সংবাদ। শুনেছি কারফিউ উপেক্ষা করে শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসা সহস্র মানুষের মিছিল। আরও শুনেছি মিছিলকে লক্ষ্য করে পাক-আর্মির করা ব্রাশ ফায়ারের শব্দ। নিজের চোখে দেখেছি পাক আর্মির গুলিতে নিহত ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন ইটাখলার নিরপরাধ শ্রমিকের লাশ। আরও লাশ দেখেছি, আটকে আছে মনু ব্রিজের নিচে। এই দুই দিন কানুদা ফিরে আসেননি। অজানা আশঙ্কায় দুটি রাত কেটেছে কানুদার পরিবার, এবং আমাদের সবার।

(ঙ)

মৌলভীবাজার শহরে আঠাশ মার্চ কয়েক ঘণ্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হলো। সাথে সাথে অবরুদ্ধ শহরের নিদ্রাহীন মানুষগুলো যেনো শহর ছেড়ে পালানোর জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো। যাবার আগে হুমরি খেয়ে পড়লো সবাই জরুরি রসদ সংগ্রহে। আবারও কতোদিন কোথায় কীভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হয়, কে জানে! আমিও আব্বার সাথে ব্যাগ হাতে বাজারে গেলাম। দেখলাম শহরে জিপে করে টহল দিচ্ছে সাক্ষাত মৃত্যুদূত পাক আর্মি। হাতে উদ্যত বন্দুক, ব্যারেলের সাথে লাগানো বেয়োনেট। বাসায় ফেরার পথে দেখি আমাদের পাড়ার রাকেশ কর-এর (রাকেশ মোক্তারের) বাসার সামনে একটা আর্মি জিপ দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি, গাড়ির মেঝেতে বসে আছেন আমাদের কানুদা, দুই দিকের সিটে বন্দুক ও রুলার হাতে বসা দুই আর্মি। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় তার রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন, চোখে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুধারা। সহজেই বোঝা যাচ্ছিলো গত ২দিন তার শরীরের উপর দিয়ে কেমন অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছে। পাকিস্তানি কুত্তারা কানুদাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে রাকেশ করের বাসা সার্চ করতে। পরে শুনেছি, কানুদার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তারা রাকেশ কর-এর ছেলে অধ্যাপক বলাই কর-এর কাছে গোপনে রক্ষিত ওয়্যারলেস উদ্ধার করতে এসেছিলো। কুত্তারা কিছুই পায়নি। থাকলেতো পাবে! কানুদা হয়তো শারীরীক নির্যাতন থেকে বাঁচার আশায় আবোল-তাবোল তথ্য দিয়েছেন। সত্য কথায় কেউ বিশ্বাস না করলে অমানুষিক নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় মানুষ এমন বানোয়াট কথা বলে। কানুদার সারা শরীরে নির্মম নির্যাতনের চিহ্ন দেখে আমার সেটাই মনে হচ্ছিলো। আমি জিপটার কাছে একটু এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আর্মি কুত্তাটা আমাকে ধমক দিয়ে চলে যেতে বললো।

অন্য সবার মতো আমিও সেদিন জিপটাকে পেছনে ফেলে চলে গিয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে কানুদার সাথে আমার সেটাই ছিলো শেষ দেখা। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় এর পর অসহায় মানুষ শহর ছেড়ে যে যেদিকে পারে, পালিয়ে গিয়েছিল। স্বাধীন হওয়ার পর শুনেছি মুক্তিযোদ্ধা-জনতার প্রতিরোধের মুখে ভীত হয়ে পাকিস্তানি সেনারা সাময়িকভাবে মৌলভীবাজার ছেড়ে পালিয়েছিল। পালিয়ে যাওয়ার আগে তারা কানুদাসহ আটক সবাইকে মেরে ফেলে।

আমাদের পরিবারের কেউ না হয়েও কানুদা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হওয়া আমাদের পরিবারের সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ট ব্যক্তি। তাই কানুদার অত্মদানের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, সেটা ভেবে কানুদার জন্য আমরাও আজ গৌরব অনুভব করি।

(ঙ)

তিরিশ লক্ষ মানুষ আর তিন লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে স্বাধীন-সার্বভৌম গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক আমরা। কথাটি অত্যন্ত গর্বের। কিন্তু আমি সেভাবে বলতে পারিনা। কানুদার সাথে সেই শেষ দেখার দৃশ্যটি যখন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে, তখন মনে হয়, এই গর্ব অর্থহীন। আমার মনে হয়, কানুদার সেই নিরব চোখের ভাষা আমার এবং আমাদের পুরো জাতির উপর হন্তারকদের বিচারের যে দায় চাপিয়ে দিয়েছিল, সে দায় থেকে আমরা আজও মুক্তি পাইনি। এমন মনে হওয়ার কারণ এই নয় যে, যেসব লক্ষ্য সামনে নিয়ে জাতি স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে লক্ষ্যগুলো অর্জিত হয়নি। সংকীর্ণভাবে, এমন মনে হওয়ার কারণ, যাদের কারণে কানুদার মতো নিরপরাধ পরোপকারী ভালো মানুষটি পাকিস্তানি কুত্তাদের হাতে ধরা পড়ে অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করে শহীদ হলেন, সেসব জাতীয় বেঈমান বিশ্বাসঘাতক দালাল এবং যুদ্ধাপরাধী পাক সেনাদের বিচার করতে ব্যর্থ হওয়া। আমার মতে, বৃহত্তর জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যর্থতার অর্থ, চল্লিশ বছর আগে বাঙলার মানুষ যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তা আজও সম্পূর্ণ হয়নি।

দেরিতে হলেও একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী ঘাতক-দালালদের বিচারের জন্য বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছে, এবং বিচার প্রক্রিয়া সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা সত্যি যে, এই ট্রাইবুনাল গঠনের তোর-জোড়ে আমরা যতোটা আশার আলো দেখেছিলাম, ট্রাইবুনালের কার্যক্রমের ধীর গতি সে আশার আলোতে কিছুটা শঙ্কার ছায়াও দেখা যাচ্ছে।